‘উপেন’ এখন বাজারে

আব্দুল বায়েস

সময়ের বিবর্তনে শহরভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মোটাদাগের সুবিধা গ্রামে চুইয়ে পড়ার ক্ষেত্রে বাজার নামক প্রতিষ্ঠানটি এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে গণ-অবকাঠামোতে বিনিয়োগ (যেমন রাস্তা, সেতু, স্কুল, বিদ্যুতায়ন) এ চুইয়ে পড়া প্রক্রিয়ার পেছনে প্রধান চালিকাশক্তি বা লিঞ্চপিন হিসেবে কাজ করে। গণ-অবকাঠামোগত উন্নয়ন বাজারে অংশগ্রহণ করা ও বাজারের সুযোগ গ্রহণে গ্রামবাসীর তথা উপেনদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘দুই বিঘা জমি’র উপেন ঋণগ্রস্ত হয়ে সর্বস্বান্তের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়—‘শুধু বিঘে দুই, ছিল মোর ভুঁই, আর সবি গেছে ঋণে।’ তবে ওইদিন গতপ্রায় যখন ঋণ মানে মহাজন, ঋণ মানে কেবলই শোষণ। মহাজন ও ভূস্বামী ছাড়াও আজকাল উপেনদের জন্য নানা উৎস থেকে ঋণ আসে যেমন—এনজিও, সমবায় বা সরকার। সেই ঋণ ব্যবহার করে ফসল কিংবা ফসল-বহির্ভূত উৎপাদন আজকাল বাজারে নিয়ে যায় উপেনরা। ফসল তো আছেই, ফল ও ফুলের কদর আছে বাজারে, যা অতীতে ছিল না। আর তা না হলে অকৃষি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে, দরকার হলে শহরে পাড়ি দিয়ে, অন্তত পেটে দুমুঠো অন্ন দেয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়। মোটকথা, বাজার নামক প্রতিষ্ঠানটি ভাগ্যের দরজা খোলার চাবি আগে ছিল শুধু তার ‘বাবুর’, এখন উপেনেরও। এটাই বস্তুত রূপান্তর, যা ঘটেছে বাংলাদেশে গত ৫০ বছরে।

বাংলাদেশের গ্রামে তথা কৃষি খাতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যদি বলি বাংলাদেশে কৃষি রূপান্তরের রূপকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাহলে ভুল বলা হবে না। তার নেতৃত্বে গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শুরুতে যে দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল তার একটি হচ্ছে উর্ধ্বমুখী জনসংখ্যার হার নিচে নামানো আর নিম্নগামী, অনেকটা স্থবির এবং সেকেলে কৃষি খাতকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে ওপরে টেনে তোলা, যাতে দেশের মানুষ থাকে দুধে-ভাতে। সে সময়কার সরকার সমন্বিত কৃষি, সমবায় কৃষি, কৃষি শিল্প, কৃষি শিক্ষা, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি গবেষণা বিস্তারে বেশকিছু পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যা থেকে আজও শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। এমনকি জমির মালিকানায় সিলিং নির্ধারণের মতো একটা ‘বৈপ্লবিক’ (এবং সাহসিক) পদক্ষেপের পক্ষেও অবস্থান ছিল জোরালো, সে কাহিনী না হয় অন্য একদিন বলা যাবে।

দুই। ৫০ বছর আগে বাংলাদেশের কৃষি তথা খাদ্যলভ্যতার চালচিত্র পরিসংখ্যানে পরিব্যাপ্ত না হয়ে বরং কবিসাহিত্যিকের উদ্ধৃতি থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়:

‘এখনও এই অগ্রহায়ণের শেষেও প্রায় গোড়ালির উপর পর্যন্ত সেখানে কাদায় ডুবিয়া যায়। ধান পাকিতেছে, তাহার শীষগুলি নুইয়া পড়িয়াছে স্তবের মতো, অধিকাংশই লুটাইয়া পড়িয়াছে কাদার মধ্যে। মজা বিলের জমি, এমন হইবেই। কোনো বৎসরই লাভজনক ফসল এখান হইতে পাওয়া যায় না। পানি জমিয়াই প্রায় অর্ধেকেরও বেশি ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে। গহুরালি মনে মনে ভাবিল, আর কাঁহাতক এইভাবে দুটি দুটি ধান খুঁটিয়া জীবন চালানো যায়।’ (শামসুদ্দিন আবুল কালাম, পথ জানা নাই)।

৫০ বছর আগে ছিল প্রকৃতিনির্ভর, সনাতনী ও জীবন নির্বাহের কৃষি কর্মকাণ্ড এবং ব্যবস্থাপনা। সনাতনী কৃষি ব্যবস্থা, কৃষি কাঠামোতে বিদ্যমান বৈষম্যের বীজ, উৎপাদনবিমুখ উৎসাহ, বর্গা বাজারে বর্গীয় বণ্টন ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি অসম তথ্যপ্রবাহ নিয়ে ৫০ বছর আগের বাংলাদেশের কৃষি ছিল অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদনশীল এবং বৈষম্যবান্ধব। সর্বোপরি ওই সময়কার কৃষিতে রাজা ছিল বড় ও মাঝারি চাষী, বাকি সব প্রজা। সময়ের বিবর্তনে আজকের কৃষি আধুনিক উপকরণে সমৃদ্ধ, বড় ও মধ্যম চাষীর প্রস্থানের ফলে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষী অধ্যুষিত কৃষি খাত। আগের আমলে ৮০ ভাগ চাষ হতো হালের বলদ দিয়ে, ইদানীং ট্রাক্টরে চাষ হয় তার চেয়ে বেশি। ৫০ বছর আগে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি ছিল লুইসিয়ান মডেলের আদলে আবর্তিত উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাশূন্য অথবা ঋণাত্মক। এখন শহরে অভিবাসন ও অকৃষি কর্মকাণ্ডের ব্যাপক

বিস্তারের কারণে শ্রমিকস্বল্পতা মজুরি করেছে উর্ধ্বমুখী, শ্রমের বাজার অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক। সেই আমলে যেকোনো শর্তে এক খণ্ড জমির জন্য বর্গাচাষী ছুটতেন জমির মালিকের পেছনে, আর এখন মালিক ছোটেন চাষীর পেছনে জমি বর্গা দেয়ার জন্য, প্রগতিশীল শর্তে। ৫০ বছর আগে মোট বর্গা জমির ৮০ ভাগ চাষ হতো অদক্ষ ও শোষণমূলক ‘ফসল ভাগাভাগি’ (৫০:৫০) পদ্ধতিতে, এখন বাজারমুখী স্থির খাজনা আর ইজারা ব্যবস্থার দাপট। মাঠে-ময়দানের কৃষিতে নারী শ্রমিক ছিল কল্পনা, এখন বাস্তব। ৫০ বছর আগে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে কামলা বা বান্ধা মজুর থাকত, তা না হলে দৈনন্দিন শ্রমিক। এখন বাজারমুখী চুক্তিভিত্তিক কাজ হয় দরকষাকষিতে রফা টেক অর লিভ ইট। শ্রমবাজারের এমনতর বিবর্তনের ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তবে এতটুকু বলা যায় যে সবই হচ্ছে বাজারের সিগন্যালে। এমনকি জমির ব্যবহারে পরিবর্তন কী হবে, তাও বাজার বলে দেয় ভিটেতে শাকসবজি, হাঁস-মুরগি, পুকুরে পরিকল্পিত মাছ চাষ, ফসলের জমিতে ফুল ও ফলের বাগান বড় করা ইত্যাদি। উপেনের দুই বিঘা জমি নেহাত কম নয় এসব উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডের জন্য।

তিন। কালের আবর্তনে বাঁধ বা ড্যাম নির্মাণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি (গণ-অবকাঠামো) ঘটার ফলে উপেনের মতো ছোট বা প্রান্তিক এমনকি কার্যত ভূমিহীনের বাজারে অংশগ্রহণ সহজ হয়, গ্রাম তথা কৃষির চেহারা ধীরে ধীরে পাল্টাতে থাকে, সাথে উপেনের চেহারাও। আসে আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি উচ্চফলনশীল ধান তথা উফশী। সবুজ বিপ্লবের চাদরে আবৃত বিশিষ্ট উপাদান আধুনিক ধান, আধুনিক সেচ ও আধুনিক সার না এলে হয়তো রক্তাক্ত ‘লাল বিপ্লব’ দেখতে হতো কিনা কে জানে। ৫০ বছর আগে সাত কোটি মানুষের দেশে (এবং ৯৯ লাখ হেক্টর জমিতে) খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো এক কোটি টন, হেক্টরপ্রতি এক টন মাত্র। এ নিয়ে ম্যালথুসিয়ান দুঃস্বপ্নের দোরগোড়ায় বাংলাদেশ দাঁড়িয়েছিল, দুর্ভিক্ষের আঁচড়ও লেগেছিল গায়ে। এখন ১৬ কোটি মানুষের দেশে প্রায় একই পরিমাণ জমিতে চার কোটি টনের ওপর উৎপাদন, হেক্টরপ্রতি তিন টন। বাংলাদেশ এখন আউট অব দ্য শেডো অব ফেমিন। ধানের শীষগুলো আগে যেমন স্তবের মতো নুইয়ে পড়ত তেমনটি না, এমনকি হাওর অঞ্চলের লিলুয়া বাতাসে দোল খায়। আজকাল বিলেও আধুনিক ধান হয় এবং দুটি ধান খুঁটে জীবন চালানোর দিন শেষ প্রায়। মাথাপিছু ভাত খাওয়ার পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান; উল্লসিত জনতার বুকে এখন মানচিত্র শোভা পায়, যা পেটে যাওয়ার কথা ছিল কবির কথায়—‘ভাত দে হারামজাদা, তা না হলে মানচিত্র খাবো।’

এমন সব পরিবর্তনের হাওয়া ও এর প্রকৃতি নিয়ে লিখেছেন সাহিত্যের অন্য এক দিকপাল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়:

‘সে কাল আর নাই। কালের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মাঠের বুক চিরিয়া রেললাইন পড়িয়াছে। তাহার পাশের টেলিগ্রাফ তারের খুঁটির সারি। বিদ্যুৎশক্তিবহ তারের লাইন। মেঠোপথ পাকা হইয়াছে। তাহার উপর দিয়া উর্ধ্বশ্বাসে মোটরবাস ছুটিতেছে। নদী বাঁধিয়া খাল কাটা হইয়াছে। লোকে হুক্কা ছাড়িয়া বিড়ি-সিগারেট ধরিয়াছে। কাঁধে গামছা, পরনে খাটো কাপড়ের বদলে বড় বড় ছোকড়ারা জামা, লম্বা কাপড় পরিয়া সভ্য হইয়াছে। ছআনা, দশআনা ফ্যাশনে চুল ছাঁটিয়াছে। ভদ্র গৃহস্থ ঘরের হালচাল বদলাইয়াছে (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ‘রাইকমল’)।’

চার। ৫০ বছরে বাংলাদেশের সব ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু সাফল্য এসেছে। তবে কৃষির ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অতুলনীয়। বস্তুত বাংলাদেশের কৃষির গল্প বলা মানে একটা জীবন নির্বাহের কৃষি থেকে লাভজনক বা বাণিজ্যিক কৃষিতে উত্তরণের গল্প বলা। এ দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণে লাভের গুড় ইঁদুরে খেয়েছে সত্যি, তবে নিঃসন্দেহে সবটুকু নয়। মনে রাখতে হবে, সব ওষুধেরই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে। তাই বলে ওষুধ ছেড়ে দিয়ে জীবন বিপন্ন করে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া প্রতিহত করা চরম বোকামি বৈ কিছু নয়।

থাক সে কথা। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে মোট ধান উৎপাদনের মাত্র এক-চতুর্থাংশ বাজারে আসত, ৫০ বছর পর ৫০ ভাগের বেশি ধান বাজারমুখী; গম বাজারে যায় প্রায় ৭০ শতাংশ ৫০ শতাংশের বিপরীতে, গোল আলু এখন ৮০ ভাগ বাজারে নেয়া হয় ৫০ বছর আগে যা ৫০ ভাগের নিচে ছিল। পাট, ইক্ষু এমনকি পেঁয়াজ আগে ৮০ ভাগের বেশি বাজারজাত করা হতো, পরবর্তী সময়ে প্রান্তিক বেড়েছে বৈকি। বাজারের নির্দেশে ভুট্টা নামক পণ্যটি এখন অবাধে উৎপাদিত হয়ে পোলট্রি শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে, যেমন ডিম ও দুধের উৎপাদন বেড়েছে বহুগুণ এবং বেশির ভাগ বিক্রির জন্য। আগের দিনে হাঁস-মুরগি ছিল ঘরের কোণে, এখন খামারে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লালনপালন। তার মানে কৃষিপণ্যের বাজারমুখিতা বেড়েছে, অর্থকরী ফসলের তো বটেই, এমনকি প্রাণ বাঁচানো ধানের বেলায়ও। এখন কৃষকের হাতে সেলফোন থাকে পণ্য ও উপকরণের বাজারদর যাচাই করার জন্য, আর তাই তাকে ঠকানো অত সহজ নয়, যেমনটি ছিল ৫০ বছর আগে। চুক্তিভিত্তিক চাষ বেড়েছে, দালালের দাপট কমেছে, তার পরও কৃষক পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হন যথাযথ নীতিমালা ও প্রযুক্তির অভাবে। কৃষকের জন্য বাজার নামক প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি। তবে অবশ্যই তা হতে হবে দক্ষ বাজার।

গল্পটা এখানেই শেষ হতে পারত, কিন্তু একটা প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়। সেটা হলো ফসলের উৎপাদন বা বাজারজাত বৃদ্ধির কারণে উপেন তথা ভূমিহীনের কিংবা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর লাভ কোথায়? বস্তুত এ প্রশ্নটাই তৎকালীন সমাজবিজ্ঞানীদের তাড়িত করে বলতে বাধ্য করেছিল যে সবুজ বিপ্লব ধনীকে আরো ধনী বানাবে, গরিব হবে আরো গরিব। ব্যয়বহুল সবুজ বিপ্লবের ফসল ধনীর ঘরে গিয়ে বিদ্যমান বৈষম্যকে তির্যক করার তীর হিসেবে কাজ করবে।

অন্যদিকে প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণ বলছে অন্য কথা। ধান বা চালের কথাই ধরি। সময়ের বিবর্তনে চাল উৎপাদন ও বাজারজাতে ভূমিহীন খানার অংশগ্রহণ বাড়ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিপণনযোগ্য উদ্বৃত্ত বা মার্কেটেবল সারপ্লাস (উৎপাদন ভোগ) দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একই চিত্র মেলে। যদিও যার জমি বেশি উদ্বৃত্ত তার বেশি এবং সেহেতু বাজারমুখিতা অধিকতর। উদাহরণ, ৫০ বছর আগে উপেনের মতো ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষী মোট ধান উৎপাদনের গড়পড়তা ২০ ভাগ বাজারে নিতেন, ইদানীং ৪০ ভাগ। ৫০ বছর আগে নিখাদ ভূমিহীন ও কার্যত ভূমিহীন খামারের ৭০-৮০ ভাগ ছিল খাদ্যঘাটতি খামার, এখন শুধু নিখাদ ভূমিহীনদের ৪০ ভাগ ঘাটতি খামার। এর কারণ অজানা থাকার কোনো কারণ নেই। উদরপূর্তি ও উদ্বৃত্তের উৎসে আছে উফশী ধান, নগদ যা পাও হাত পেতে নাও এবং বিস্তৃত বর্গা বাজার ও সেই সাথে উদীয়মান বাজারনির্ভর শর্ত যেমন ভাগ চাষের জায়গায় লিজিং বা স্থির খাজনা পদ্ধতি।

কৃষি খাতের অন্য এক স্তম্ভ মাছের কথা বলতেই হয়। ৫০ বছর কিংবা তার আগেও এ দেশে জেলে সম্প্রদায় মাছ ধরত; ভাতের বাসনে মাছ থাকত বলে বলা হতো ‘মাছে-ভাতে বাঙালি’। তবে সবুজ বিপ্লবের ধাক্কায় মাছ চাষ মার খায় সার, কীটনাশক ব্যবহার এবং সর্বোপরি হাভাতের ভাতের তাড়নায়। এখন পৃথিবীতে প্রথম কাতারে মাছের দেশ বাংলাদেশ এবং অনুমান করা যায়, প্রবৃদ্ধির হার গড়পড়তা ৫ শতাংশ, অভ্যন্তরীণ মাছ এখন রফতানির ২ ভাগ, জিডিপিতে মাছের অবদান প্রায় ৪ শতাংশ, বিশেষত কৃষি জিডিপিতে প্রায় ২৫ ভাগ। মোট প্রোটিনের ৬০ ভাগ আসে মাছ থেকে। মাছ চাষ, প্রসেসিং, ফার্মিং, সব মিলিয়ে এক-দুই কোটি লোকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান। সবচেয়ে বড় কথা, মাছ চাষ এখন আর ‘নিম্নবর্গীয়’ জেলেদের পেশা নয়, উচ্চবিত্তরা নেমেছে মাছের ব্যবসায়। মোটকথা, মাছ চাষ এখন পরিকল্পিত, বৈজ্ঞানিক ও বাণিজ্যিক, যা ৫০ বছর আগের দৃশ্য নয়।

বাংলাদেশের গ্রাম-গবেষণায় জাপানি অর্থনীতিবিদ ইউজিরো হায়ামি ও এম কিকুচির পর্যবেক্ষণ গুরুত্বসহকারে বিবেচনার দাবি রাখে। বিশেষ করে তাদের বই থেকে নেয়া দুটো হাইপোথিসিস পরীক্ষণীয়। প্রথমত, সময়ের বিবর্তনে শহরভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মোটাদাগের সুবিধা গ্রামে চুইয়ে পড়ার ক্ষেত্রে বাজার নামক প্রতিষ্ঠানটি এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। একই সাথে এটাও মনে রাখতে হবে যে, গণ-অবকাঠামোতে বিনিয়োগ (যেমন রাস্তা, সেতু, স্কুল, বিদ্যুতায়ন) এ চুইয়ে পড়া প্রক্রিয়ার পেছনে প্রধান চালিকাশক্তি বা লিঞ্চপিন হিসেবে কাজ করে। গণ-অবকাঠামোগত উন্নয়ন বাজারে অংশগ্রহণ করা ও বাজারের সুযোগ গ্রহণে গ্রামবাসীর তথা উপেনদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করে। যদি এসব অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো যায়, তাহলে নিশ্চিত যে বড় মাপের উন্নয়নকল্পে গ্রামবাসীর পক্ষে বাজারকে বশ করার ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়ত, প্রথাগত কৃষি কমিউনিটিতে বাজারের অনুপ্রবেশ (অ্যানক্রোচমেন্ট) উপেনের মতো গ্রামীণ দরিদ্রের মধ্যে অধিকতর বৈষম্য ও দুর্দশা ডেকে আনে বলে একটা ধারণা আছে। তবে হায়ামি ও কাকুচির ইস্ট লেগুনা গ্রামের অভিজ্ঞতা এমনতরো হাইপোথিসিস নাকচ করে দেয়। উপরন্তু ষাটের দশক থেকে কয়েক দশক ধরে গ্রামটির অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে দরিদ্রের দুর্দশা বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে পারত, যদি শহরভিত্তিক বাজার কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে গ্রামবাসী একটা বিচ্ছিন্ন পরিবেশে প্রথাগত কৃষির ওপর নির্ভরশীল থাকত।

সম্পদ ও সুযোগের মিশ্রণ ঘটায় বাজার। তেমনি করে মূলত বাজারের কল্যাণে, বাংলাদেশে গত ৫০ বছরে ঘটেছে রূপান্তর উপেন এবং অন্যদের জীবন ও জীবিকায়—রূপকথা নয় সে নয়।

আব্দুল বায়েস: প্রাক্তন উপাচার্য ও অর্থনীতির অধ্যাপক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও খণ্ডকালীন শিক্ষক, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি